গালি দেয়!!! হ্যাঁ রা, আগে মিয়াঁ সাহেব কই মান দিত। আজ কয় হারামজাদা!!!' বিবি বদরের মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে। বদর নরম বুকে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করে। বিবির চোখের নোনা পানি বদরের কানের পিছনে এসে পড়তে থাকে।

* * *

নোয়াখালির বর্ষা এক বিভীষিকা। যখন নামে, যেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নামে। একেই তো হালকা নোনা পলিমাটি। তার উপর ঝেঁপে বৃষ্টি, মাটিকে একদম সাবান-গোলা জলের মতো পিচ্ছিল করে দেয়। খাল, বিল, হাওড়, বাঁওড় সব একদম টুবু টুবু। একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরে চলতেই থাকে। সেই কদিন অনেক বাড়িতে আগুন জ্বালানোর পর্যন্ত উপায় থাকে না। সারাবছর অধিকাংশ বাড়ির রান্না উঠোনে হয়। উঠোনে মাটির উনুন করা। সেগুলো থেকে বৃষ্টিতে মাটি গলে গলে পড়ছে। উনুনের ভিতরেও জল। কাঠও একদম সপসপে ভিজে। তবে! হাঁড়িটা চড়বে কী করে!

ও পাড়ার ধাঙড় বাচ্চাগুলো সব ন্যাংটা পোঁদে রাস্তার উপরেই পিছল খাচ্ছিল। দূর থেকে দৌড়ে এসে রাস্তার ঢালু অংশের কাদার উপর পোঁদটাকে ভাসিয়ে দেওয়া। একজনের গতি একটু কমে গেলে পিছনের জনের ধাক্কা তার গতি বাড়িয়ে দেয়। মঙ্গল নায়েব ছাতা নিয়ে ওদের তারা করল। ছেলেগুলো পিছল খেয়ে খেয়ে রাস্তাগুলোকেও ভীষণ পিছল করে দিয়েছে। নিজেকে না সামলালে নায়েবই আজ পড়ত। পনেরো বছর ধরে জমিদার শশীভূষণবাবুর কাজ করছে মঙ্গল। নিজেরটা খানিকটা গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু, বউয়ের গঞ্জনা ঠিক শুনতে হয়। সে বোকা বলে বাকি নায়েবদের মতো জমিজমা করতে পারেনি। কিন্তু, আকালের সময় সে-ই উদ্যোগ নিয়ে গয়না নিয়ে ধান বিক্রি করেছে। জমিদারবাবু প্রজাদের এমনিই ধার দিতে চেয়েছিলেন। সে-ই বুঝিয়েছে, জমিদারির আয় ভালো নয়। পাশের গ্রামের জমিদার কিরণবাবুদের সঙ্গে মামলাও চলছে। তা ছাড়া এমনিতে ধান

প্র স ব কা ল

ঐতিহাসিক নোয়াখালি দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে

রচিত মর্মস্পর্শী উপন্যাস

সুমন চক্রবর্তী

কৈফিয়ত

শ্রীপুর-নন্দিগ্রাম মেঘনার তীরে গড়ে-ওঠা একটা শান্ত গ্রাম। মেঘনার প্রবাহের মতোই ধীর লয়ে বয়ে চলেছে এই গ্রামের জীবনধারা। হিন্দুপ্রধান এই গ্রামের জমিদার শশীভূষণ চক্রবর্তী। তবে, জমিদারবাড়ির ভেতরে রাজত্ব চলে ওঁর পিসিমার। পিসিমার সেনাপ্রধান পাঁচুর মা। পিসিমা কারও উপর ক্ষিপ্ত হলে, পাঁচুর মা তাঁর হয়ে গালাগালি করে দেন। সেই গালি শুনে মরা শুঁটকিও জ্যান্ত হয়ে উঠতে পারে। বাল্যবিধবা পিসিমা আদরে-শাসনে গ্রামটাকে 'মানুষ' করে তুলছেন।

সুপ্রাচীন বরাহি মন্দির গ্রামের গর্ব। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মায়ের পূজায় অংশগ্রহণ করেন। বংশপরম্পরায় মন্দিরের সেবায়েত রামগোপাল চক্রবর্তী। তিনি গ্রামের একমাত্র উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি গ্রামের নৈতিক অভিভাবকও। ভরা সংসার ওঁর। ছেলেরাও প্রত্যেকেই শিক্ষক। ওঁর তৃতীয় ছেলে প্রফুল্ল জমিদারবাড়ির জামাই।

সারা বাংলার সঙ্গে এই গ্রামও আকালের সম্মুখীন হয়। তারপর থেকে গ্রামের আর্থসামাজিক সমীকরণ দ্রুত বদলাতে থাকে। এই সুযোগে মুসলিম লিগ আর কৃষক সমিতি তাদের রাজনৈতিক পরিসর দখলে আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ধর্ম ব্যবহৃত হতে থাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। তৈরি হয় ঐতিহাসিক নোয়াখালি দাঙ্গার প্রেক্ষাপট।

'প্রসবকাল' প্রাক্-স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে লেখা ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস। আজ থেকে ঠিক পঁচাত্তর বছর আগের কথা। ঘটনাকালটা অবশ্য জাতি হিসেবে

বাঙালির দুর্যোগের সময়। সেই তমসাচ্ছন্ন সময়ে বাঙালি আকাল ও অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্মুখীন হয়েছে। দেশবিভাগ ও বাংলা ভাগের কারণ বিশ্লেষণ করলে, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে নোয়াখালি গণহত্যা সর্ববৃহৎ। নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর এই একপেশে গণহত্যার বীভৎসতা স্তম্ভিত করে দেয়। ১০ অক্টোবর ১৯৪৬ এই গণহত্যা আরম্ভ হয়। ঘটনার আরম্ভ রামগঞ্জ অঞ্চলে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালির সর্বত্র। কয়েক হাজার মানুষ নিহত ও লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। কয়েক হাজার মানুষের রক্তে নোয়াখালির মাটিকে প্লাবিত করে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। কেবলমাত্র গণহত্যা নয়; ব্যাপক নারীনির্যাতন ও গণধর্মান্তরণ এই নৃশংসতাকে অনন্য মাত্রা প্রদান করেছিল। এই গণহত্যা নিবারণে গান্ধিজি নোয়াখালিতে পৌঁছোন এবং পদব্রজে বিপর্যস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন। কথা বলেন বাস্তুচ্যুত মানুষদের সঙ্গেও। তবে, গান্ধিজি চৌমুহনির যোগেন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে পৌঁছোন ৭ নভেম্বর। তখন নোয়াখালির ধ্বংসকার্য প্রায় সমাপ্ত। ১০ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে সরকারি নিষ্ক্রিয়তায় মুসলিম লিগের তাণ্ডব ছিল অবাধ, নৃশংস, অমানবিক। না, গান্ধিজির আশ্বাসের পরেও একটা বড়ো অংশের বাস্তুচ্যুত মানুষ নিজের ভিটেতে ফিরে আসতে সম্মত হননি। ভাঙা কাচের পাত্র আর জোড়া লাগানো যায় না যে!

এই গণহত্যার প্রকৃত কারণ কী ছিল? কী এমন ঘটেছিল, যার ভিত্তিতে একই গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিবেশীদের প্রতি এত নৃশংস হয়ে উঠেছিল? এর প্রকৃত কারণ আজ ইতিহাসের গর্ভে তলিয়ে গেছে। তবে, সমসাময়িক সংবাদপত্র, লেখা, সরকারি নথি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে কারণগুলি অনুমান করা সম্ভবমাত্র। ওই সময়ে শ্রীপুর-নন্দিগ্রামের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, গণহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র প্রথম তিন দিনের বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই গণহত্যা বর্ণনার নথি, পাঠক হিসেবে আমার বিনিদ্র রজনির কারণ হয়েছিল। আমি চাইনি, এই বইয়ের পাঠকরাও পাতার পর পাতা বীভৎস বর্ণনার সাক্ষী

হোক।

এই উপন্যাস ঐতিহাসিক নোয়াখালি গণহত্যার প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও, ঘটনার কাহিনিবিন্যাস সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এখানে গণহত্যার বিবরণের থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে গণহত্যার প্রেক্ষাপট। নোয়াখালির তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের সারল্য, কূটনীতি, চর দখল, সংস্কৃতি পাঠকের কাছে মনোগ্রাহী হবে বলেই আশা রাখি। এখানে ঘটনার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ঘটনার প্রয়োজনে তাদের কথোপকথন ও কার্যকলাপে আংশিক কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কাল্পনিক অংশগুলির সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার সাদৃশ্য দেখা গেলে, তা নিতান্তই কাকতলীয় সংযোগমাত্র, বিবেচনার অনুরোধ জানাই।

বইটি ছাপার অক্ষরে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বইবন্ধু পাবলিশার্স-এর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি লেখায় আমার যেটুকু পরিশ্রম, প্রকাশের ক্ষেত্রে বইবন্ধু পাবলিশার্স-এর পরিশ্রম তার থেকে একবিন্দুও কম নয়। ওঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া বইটি হয়তো সত্যিই পূর্ণতা লাভ করত না। ধন্যবাদের দাবিদার জয়দেব কর্মকারদাদা ও আমার প্রাক্তন ছাত্র রোহিতও; যাদের সহযোগিতা ও ধারাবাহিক উৎসাহপ্রদান বইটার যাত্রাপথকে সুগম করেছে। আশা করি, বইটি পাঠকে আনন্দদানের পাশাপাশি, পাঠকের মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করবে।

—সুমন চক্রবর্তী

পুকুরপাড়ে সদ্য গজিয়ে-ওঠা চোরকাঁটার একটা ডাঁটি ছিঁড়ে, নিতাই চিবোতে চিবোতে জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। আকাশে ভালোই কালচে নিচু মেঘ ভাসছে। নইলে এই দুপুরে বড়ো মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ময়ূরের পালকের তৈরি ফাতনাটা অনেকক্ষণ ধরে ভেসেই আছে। নাঃ! আজ উঠেই পড়তে হবে। এমনিতেই অনেক বেলা হয়ে গেছে। এরপর বাড়িতে গালি খেতে হবে। মাছ দুটো টুকরিতে তুলে চারগুলো পাশে ছুড়ে ফেলে দিল। ও কয়েক পা এগোতেই কিছু জলে পড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া গেল। নিতাই পাড় ধরে একটু এগিয়ে দেখল, ওপারে বদর খাপলা ছুড়েছে।

—হেই কাটার জাত! হারামজাদা, আঙ্গ বাঁওড়ে হেতি জাল ছুড়িস কিল্লাই? জাল কাড়ি নিমু।

বদর চমকে তাড়াতাড়ি জাল গোটাতে লাগল। বাঁওড়টা দু-বছর আগে পর্যন্ত বদরুদ্দীনদের ছিল। আকালের সময় নিতাইয়ের বাবা বংশী কুণ্ডুর কাছে ধানমারি হয়েছে। ইংরেজরা এলাকার সব বড়ো নৌকা যুদ্ধের জন্য নিয়েছিল। বদরের নৌকাটাও সেই সময় হাতছাড়া হয়। তখন সে এই পুকুরের মাছ বিক্রি করেই সংসার চালিয়েছিল। কিন্তু আজও সে ভেবে পায় না, হঠাৎ করে সব ধান কীভাবে হাট থেকে উধাও হয়ে যায়! সে শুনেছিল, ইংরেজরা সৈন্যদের খাওয়ার জন্য সব ধান কিনে নিয়েছে। তাদেরই বাজেয়াপ্ত করা নৌকা ভরাট করে ধানের বস্তাগুলো মেঘনা দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে দেশি সেপাই তো ছিলই, সাহেব সিপাইও ছিল। হারামজাদাগুলো অনেক নৌকা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ওগুলো নাকি নষ্ট না করলে জাপানিরা দখল করবে। সে শুনেছে, অনেক নৌকা মেঘনা মোহানায়

গজিয়ে-ওঠা নতুন দ্বীপে ভাঙা হয়েছে। গোটা অঞ্চল এরপর খাবারশূন্য হয়ে যায়। তবে, জমিদারবাড়িসহ হিন্দু বাড়িগুলোতে কীভাবে ধান, কলাই রয়ে গেল! সব হালা চোদাইন্নার হুত! ওরা ইংরেজদের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের না খাইয়ে মারল। বংশীর পো, নিতাই বদরের ছেলে জাফরের সমবয়সি। আজ সে তার বাপের বয়সি একজনকে নোংরা গালি দিল!

আকালের সময় সে জমিদারবাড়ি থেকে ধান চাইতে গিয়েছিল। গিয়ে দ্যাখে, তার মতো গোটা নন্দিগ্রাম বড়োবাড়ি থেকে ধান নিতে এসেছে। তবে, সোনা বা চাঁদি না দিলে ধান পাওয়া যাবে না। বদর শুনে এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায়নি। তার মতো সম্পন্ন গৃহস্থ গ্রামে কমই আছে। সে কিছুতেই মা-বউয়ের গয়নায় হাত দিতে পারবে না। সংসারে বউয়ের গয়না বাঁধা দেওয়ার মতো বিপজ্জনক কাজ আর নেই। এর চেয়ে সোঁদরবনে মৌলির কাজ করা নিরাপদ। ওই গয়না ঘরে না-ফেরা পর্যন্ত দুই বউয়েরই মুখ ভার থাকবে। গ্রামেও গয়না বাঁধার কথা প্রচার হলে, তার মানসম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

কিন্তু, তখন সোনা বাঁধা দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হত। কিছুদিন হল, শশীবাবু সবার সোনা, চাঁদি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

রাগের বশে তখন সে কুণ্ডু বাড়ি থেকে এই বাঁওড়টা বাঁধা দিয়ে দুই মন চাল নেয়। সে টাকা দিয়ে ধান কিনতে চেয়েছিল; কিন্তু ধূর্ত বংশী কিছুতেই টাকা নিতে চায়নি। হাত কচলে বলেছিল, তার মতো মানী লোকের সামান্য উপকারে আসার জন্য সে কি টাকা নিতে পারে! বরং, তার নিষ্কর্মা ছেলেটাকে কর্মঠ করার জন্য পুকুরটা কিছুদিনের জন্য ধার দিলে বড়ো উপকার হয়। বংশীর বউ দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে এক মালসা মুড়ি-গুড় দিয়েছিল। সে যে বাঁওড়টা বাঁধা দিয়ে এসেছে, তা প্রথমে বুঝতেই পারেনি।

কিন্তু, যখন আকাল ভয়ংকর রূপ নিল, তার বাড়িতে চাল আছে শুনে আত্মীয়কুটুম্বরা আশ্রয় নেয়। এমনিতেই, দুই বউ ও ছাওয়াল-পাওয়াল সমেত গোটা ষোলো পেট। আকালের সময় তা আটাশে পৌঁছোয়। তার আত্মীয়কুটুম্ব কচু-ঘেঁচু খেয়ে থাকবে, তা-ই বা কেমন কথা! আল্লাহ্ তায়ালার

মেহেরবানিতে তার তো পেটের চিন্তা এতদিন করতে হয়নি! তার ফলে, দ্রুত চাল কমতে থাকে। তার বিবি দুটোও হয়েছে তেমনি! এই আকালের মধ্যেও সবাইকে তিন বেলা ভাত খাইয়েছে; এমনকি ভাত নষ্টও করেছে। বদর দেখেছে, নোংরায় ফেলে-দেওয়া সেই ভাতের উপর থেকে আলগা করে তুলে নিয়ে গেছে আসাদের বউ। এই শীতকালেও বাড়িতে দেদার পিঠেপুলি হয়েছে।

চাল বাড়ন্ত হতেই দু-মাস পরেই আবার বংশী কুণ্ডুর দরজায়। সবাই বুঝে গেছে, বদরুদ্দীনের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। কে আর এর বসা পিঁড়ি গঙ্গাজলে ধুয়ে এই অবেলায় নাইতে যাবে! বংশীর কাছে এবার ফলন্ত জমিটা বাঁধা দিতে হয়। বদরকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে হুঁকো টানতে টানতে হারামজাদাটা বেরিয়ে আসে। ধানের কথা বলতেই, আগে লেখাপড়া করিয়ে মাত্র দুই মন ধানের বিনিময়ে পুকুরটা নেয়। তারপর, ফলন্ত জমিটার বিনিময়ে ধান দিতে চায়। মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল তার। হাউড়িয়াটাকে নোংরা খিস্তি মেরে বদর বের হয়ে এসেছিল। দু-দিন চেষ্টা করে অন্য কোথাও ধান পাবার। কিন্তু, বংশী আর জমিদার ছাড়া বাকিদের কাছে বেশি ধান ছিল না। জমিদারবাড়ি থেকে তার ধান পাওয়ার আশা কম। এর মধ্যে একদিন মঙ্গল নায়েবের সঙ্গে লিগ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাই, তিন দিন পরে আবার বংশীর কাছে। বংশী তখন বাড়ির দাওয়ায় থেবড়ে বসে হুঁকো টানছিল। বদরকে পানের ছোপ-মারা হাসি দিয়ে স্বাগত জানায়। দুই বিঘা জমি বাঁধা দিয়ে, মাত্র চার মন ধান পাওয়া গিয়েছিল।

জালে যে কয়টা মাছ উঠেছিল, নিতাইয়ের সামনে ফেলে, বদর বাড়ির দিকে রওনা দেয়। অপমানে কান লাল হয়ে উঠেছে। বদরের সারা গা দরদরিয়ে ঘামতে থাকে। সে পাগলের মতো বিড়বিড় করতে থাকে, 'হেড়া-আলির হুত, ধরি হাউয়া বাঙ্গি দিয়ুম।' বাড়ি ফিরে দেখল ছাওয়ালরা কেউ নেই; বড়োবিবি কোথাও ধান কুটতে গেছে। বাড়িতে শুধু ছোটোবিবি। ঘরে ঢুকে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ছোটোবিবি দৌড়ে ঘরে আসতেই সে বলতে লাগল, 'মুই হারামজাদা হইয়ে গেসি রে! জাফরের বয়সি পোলা, জাত তুলি